২৩

স্থান -- বেলুড় মঠ
কাল -- (ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য -- স্বামীজী, ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, তবে জগতে এত বিচিত্রতা দেখা যায় কেন?

স্বামীজী -- সত্যি হন বা আর যাই হন, ব্রহ্মবস্তুতে কে জানে বল? জগৎটাকেই আমরা দেখি ও সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে থাকি। তবে সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করে বিচারপথে আগ্রসর হলে কালে একত্বমূলে পৌঁছানো যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত হতে পারতিস, তা হলে এই বিচিত্রতাটা দেখতে পেতিস না।

শিষ্য -- মহাশয়, যদি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব তবে এই প্রশ্নই বা কেন করিব? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই যখন প্রশ্ন করিতেছি, তখন উহাকে সত্য বলিয়া অবশ্য মানিয়া লইতেছি।

স্বামীজী -- বেশ কথা। সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে একত্বের মূলানুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে 'ব্যতিরেকী বিচার' বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে বাব বা সত্য বস্তু বলে ধরে নিয়ে বিচার করে দেখানো যে, সেটা ভাব নয় -- অভাব বস্তু। তুই ঐরূপে মিথ্যাকে সত্য বলে দরে সত্যে পৌঁছানোর কথা বলছিস -- কেমন?

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ, তবে আমি বাবকেই সত্য বলি এবং ভাবরাহিত্যটাকেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করি।

স্বামীজী -- আচ্ছা। এখন দেখ, বেদ বলছে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', যদি বস্তুতঃ এক ব্রহ্মই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব তো মিথ্যা হচ্ছে। বেদ মানিস তো?

শিষ্য -- বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু যদি কেহ না মানে, তাহাকেও তো নিরস্ত করিতে হইবে?

স্বামীজী -- তা ঠিক। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম করে বুঝিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। ইন্দ্রিয়গুলিও ভুল সাক্ষ্য দেয় এবং যথার্থ সত্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বলতে হয় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। তাকেই ঋষিরা 'যোগ' বলেছেন। যোগ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ, হাতে-নাতে করতে হয়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, করলেই ফল পাওয়া সায়। করে দেখ -- হয়, কি না হয়। আমি বাস্তবিকই দেখেছি -- ঋষিরা যা বলেছেন, সব সত্য। এই দেখ -- তুই যাকে বিচিত্রতা বলছিস, তা এক সময় লুপ্ত হয়ে যায় -- অনুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের কৃপায় প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য -- কখন ঐরূপ করিয়াছেন?

স্বামীজী -- একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; দেবামাত্র দেখলুম ঘরবাড়ি, দোর-দালান, গাছপালা, চন্দ্র সূর্য -- সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে গেল। তারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই; তবে মনে আছে, ঐরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল -- চিৎকার করে ঠাকুরকে বলেছিলুম, ওগো, তুমি আমার কি করছ গো, আমার যে বাপ-মা আছে! ঠাকুর তাতে হাসতে হাসতে 'তবে এখন থাক' বলে ফের ছুঁয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম -- ঘরবাড়ি দোর-দালান যা যেমন সব ছিল,

ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন আমেরিকার একটি lake-এর (হ্রদের) ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল।

শিষ্য -- (অবাক হইয়া) আচ্ছা মহাশয়, ঐরূপ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকারেও তো হইতে পারে? আর এক কথা, ঐ অবস্থাতে আপনার বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হইয়াছিল কি?

স্বামীজী -- যখন রোগের খেয়ালে নয়, নেশা করে নয়, রকম-বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে মস্তিষ্কের বিকার কি করে বলবি, বিশেষতঃ যখন আবার ঐরূপ অবস্থালাভের কথা বেদের সঙ্গে মিলছে, পূর্ব পূর্ব আচার্য ও ঋষিগণের আপ্তবাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাওরালি?

শিষ্য -- না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাস্ত্রে যখন শত শত এরূপ একত্বানুভূতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি যখন বলিতেছেন যে, ইহা করামল-কবৎ প্রতক্ষ্যসিদ্ধ, আর আপনার অপরোক্ষানুভূতি যখন বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অবিসংবাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন -- 'ক্ব গতং কেন বা নীতং'[১] ইত্যাদি।

স্বামীজী -- জানবি, এই একত্বজ্ঞান -- যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মানুভূতি বলে -- তা হলে জীবের আর ভয় থাকে না, জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারে না। সেই পরমানন্দ পেলে জগতের সুখদুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিষ্য -- আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয় এবং আমরা যদি যথার্থ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপই হই, তাহা হইলে ঐরূপে সমাধিতে সুখলাভে আমাদের যত্ন হয় না কেন? আমরা তুচ্ছ কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছি কেন?

স্বামীজী -- তুই মনে করছিস, জীবের সে শান্তিলাভে আগ্রহ নেই বুঝি একটু ভেবে দেখ -- বুঝতে পারবি, যে যা করছে, সে তা ভূমা সুখের আশাতেই করছে। তবে সকলে ঐ কথা বুঝে উঠতে পারছেনা। সে পরমানন্দলাভের ইচ্ছা আব্রহ্মস্তমব পর্যন্ত সকলের ভেতর পূর্ণভাবে রয়েছে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্তে -- ঠিক ঠিক ভাবলেই ঐ কথার অনুভূতি হয়। কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরি করে স্ত্রী-পুত্রের জন্য এত খাটছিস, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দ লাভ। সেই মোহের মারপেঁচে পড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপে নজর আসবে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খাচ্ছিস ও খাবি। ঐরূপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে -- সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জন্মে, কারও বা লক্ষ জন্ম পরে।

শিষ্য -- সে চৈতন্য হওয়া -- মহাশয়, আপনার আশীর্বাদ ও ঠাকুরের কৃপা না হইলে কখনও হইবে না।

স্বামীজী -- ঠাকুরের কৃপা-বাতাস তো বইছেই। তুই পাল তুলে দে না। যখন যা করবি, খুব একান্তমনে করবি। দিনরাত ভাববি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ -- আমার আবার ভয়-ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি -- সবই ক্ষণিক, এর পারে যা, তাই আমি।

শিষ্য -- ঐ বাব ক্ষণিক আসিলেও আবার তখনই উড়িয়া জায় এবং ছাইভস্ম সংসার ভাবি।

---

[১] বিবেকচূড়ামণি, ৪।৮।৩

স্বামীজী -- এ-রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে; ক্রমে শুধরে যাবে। তবে মনের খুব তীব্রতা, ঐকান্তিক এচ্ছা চাই। ভাববি -- আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, আমি কি কখনও অন্যায় কাজ করতে পারি? আমি কি সামান্য কামকাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের মতো মুগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি করে জোর করবি; তবে তো ঠিক কল্যাণ হবে।

শিষ্য -- মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ডেপুটিগিরির জন্য পরিক্ষা দিব -- ধন মান হবে, বেশ মজায় থাকব।

স্বামীজী -- মনে যখন ও-সব আসবে, তখন বিচার করবি। তুই তো বেদান্ত পড়েছিস? ঘুমুবার সময়ও বিচারের তরোয়ালখানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগোতে পারে। এইরূপে জোর করে বাসনা ত্যাগ করতে করতে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আসবে, তখন দেখবি স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য -- আচ্ছা স্বামীজী, ভক্তিশাস্ত্রে যে বলে বেশি বৈরাগ্য হইলে ভাব থাকে না।

স্বামীজী -- আরে ফেলে দে তোর সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ও-রকম কথা আছে। বৈরাগ্য -- বিষয়বিতৃষ্ণা না হলে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে 'ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেহপি' -- ব্রহ্মার কোটিকল্পেও জীবের মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল তীব্র বৈরাগ্য আনবার জন্য। তা যার হয়নি, তার জানবি -- নোঙর ফেলে নৌকোয় দাঁড়টানার মতো হচ্ছে! 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।'

শিষ্য -- আচ্ছা মহাশয়, কামকাঞ্চনত্যাগ হইলেই কি সব হইল?

স্বামীজী -- ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি! সেটা যে-সে লোক সামলাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে। এই যে মঠ-ফট করছি, নানা রকমের পরার্থে কাজ করে সুখ্যাতি হচ্ছে -- কে জানে, আমাকেই বা আবার ফিরে আসতে হয়।

শিষ্য -- মহাশয়, আপনিই ঐ কথা বলিতেছেন, তবে আমরা আর যাই কোথায়?

স্বামীজী -- সগসারে রয়েছিস, তাতে ভয় কি? 'অভিরভীরভীঃ' -- ভয় ত্যাগ কর। নাগ-মহাশয়কে দেখেছিস তো? -- সগসারে থেকেও সন্ন্যাসীর বাড়া! এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। গেরস্ত যদি কেউ হয় তো যেন নাগ-মহাশয়ের মতো হয়। নাগ-মহাশয় পূর্ববঙ্গ আলো করে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বলবি -- যেন তাঁর কাছে যায়, তা হলে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য -- মহাশয়, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; নাগ-মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা সহচর, তাঁকে জীবন্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়!

স্বামীজী -- তা একবার বলতে? আমি তাঁকে একবার দর্শন করতে যাব। তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন মাঠ দেখতে আমার এক এক সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব, দেখব। তুই তাঁকে লিখিস।

শিষ্য -- আমি লিখিয়া দিব। আপনার দেওভোগ যাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইবেন। বহুপূর্বে আপনার একবার যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গ আপনার চরণধূলিতে তীর্থ হইয়া যাইবে।

স্বামীজী -- জানিস তো, নাগ-মহাশয়কে ঠাকুর বলতেন, 'জ্বলন্ত আগুন'।

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ, তা শুনিয়াছি।

স্বামীজী -- অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয় -- কিছু খেয়ে যা।

শিষ্য -- যে আজ্ঞা।

অনন্তর কিছু প্রসাদ পাইয়া শিষ্য কলিকাতা যাইতে যাইতে ভাবিল: স্বামীজী কি অদ্ভুত পুরুষ -- যেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি আচার্য শঙ্কর!